বাধ্যতামূলক নরকগৃহযাত্রা

গোপা দত্তভৌমিক

> 'এ গ্রামের সংবাদ যাঁরা রাখেন তাঁহারাই ভুবনেশ্বরের সঙ্গে একমত হইয়া স্বীকার করিবেন যে, এমন নিকৃষ্ট গ্রাম আর নাই— দুঃখে দরদ নাই, অথচ কেলেঙ্কারীর টু শব্দটি হইলেই গ্রামের ছেলে বুড়ো পুরুষ মেয়ে সবাই যেন ঘুম ভাঙিয়া আহ্লাদের চোটে একেবারে দাঁড়াইয়া ওঠে, অন্য সময় কোথায় কে থাকে তার ঠিক নাই— মনে হয়, গ্রামে লোক নাই, কিন্তু মজা পাইলেই দেখিবে, হা হা শব্দে ছুটিয়া আসিতেছে মানুষের পর মানুষ— তারা সংখ্যায় অসংখ্য, তাদের হাসিবার ক্ষমতা অসাধারণ, কথার ভঙ্গী বিচিত্র, আর সমালোচনাশীল অন্তর্দৃষ্টি সুগভীর।'
>
> (*দয়ানন্দ মল্লিক*)

জগদীশ গুপ্ত শুধু *দয়ানন্দ মল্লিক* উপন্যাসের 'খণ্ডগ্রাম' নয়, বাংলার 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট' সব গ্রামগুলি সম্পর্কই মনে হয় উপযুক্ত ধারণা পোষণ করতেন। *দুলালের দোলা* উপন্যাসটি যাঁরাই পড়েছেন তাঁরা লেখকের পূর্বসূরী এবং সমসাময়িক অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পার্থক্য লক্ষ্য করে অস্বস্তি অনুভব করেছেন। জগদীশ গুপ্তের উপন্যাস ও গল্পপাঠের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া এই বিপুল অস্বস্তি, অনেক সময় লেখক যা বলছেন তা অস্বীকার করার একটা তাড়না, আপন সমাজের অন্তর্লীন কদর্যতা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত উদ্বেগ। পাঠককে তিনি এক মুহূর্তও শান্তিতে থাকতে দেন না। প্রধানত হিন্দুজাতীয়তাবাদের প্রভাবে আমাদের গ্রামীণ ও নাগরিক সমাজের বিধিব্যবস্থা, পারিবারিক সম্পর্কগুলির অ-প্রতিবাদযোগ্য সহনীয়তা নিয়ে একটা শক্তপোক্ত ধারণা উনিশ শতকের শেষদিক থেকেই গড়ে উঠেছিল। *দেবী চৌধুরাণী*তে হরবল্লভের বাড়ির পুকুরঘাটে প্রফুল্লর বাসনমাজা তাই পাঠককুলের কাছে মহর্ষ প্রশংসা আদায় করে নেয়। বুঝতে বাকি থাকে না *দেবী চৌধুরাণী*র রূপটি নির্মোকমাত্র ছিল। স্ত্রীলোকের পক্ষে গৃহধর্মপালনের বাড়া কিছু নেই। তবে বঙ্কিমচন্দ্র প্রফুল্লর সন্তানধারণের ইতিবৃত্ত শোনাননি। তাঁর উপন্যাসে সার্থক দাম্পত্যে সন্তানের স্থান কিছু গৌণ, বিষবৃক্ষের কমলমণি— শ্রীশচন্দ্রকে ব্যতিক্রম ধরা যায়।

সমাজের বাঁধা নিয়মকানুনের দ্বারা পীড়িত ব্যক্তিসত্তার বিদ্রোহ রবীন্দ্রনাথই প্রথম দেখিয়েছিলেন— অবশ্যই আমরা *কপালকুণ্ডলা*র কথা ভুলে যাচ্ছিনা, কিন্তু এই আশ্চর্য

নারী তো মানবসংসারে প্রতিপালিত হয়নি, সে স্বভাবত আরণ্যকা। যে রবীন্দ্রনাথ 'ত্যাগ' গল্পের হেমন্ত ও কুসুমকে সৃষ্টি করেছিলেন, 'দিদি' গল্পের শশী, 'স্ত্রীর পত্রে'র মৃণাল, *চোখের বালির* বিনোদিনী, *গোরার* ললিতা, *চতুরঙ্গের* দামিনী এবং *যোগাযোগের* কুমুদিনী যাঁর মানসপ্রতিমা— তিনিই কিন্তু জগদীশ গুপ্তের তীব্রতম সমালোচক। *লঘু-গুরু* নামে জগদীশ গুপ্তের অসামান্য উপন্যাসটির রবীন্দ্রকৃত সমালোচনার মতো বিধ্বংসী লেখা আমরা কমই পড়েছি মনে হয়। লেখকের বিষয়বস্তু এবং বক্তব্যের ভিত্তি সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথ সংশয় প্রকাশ করেছেন অর্থাৎ কথাবস্তুর বিশ্বাসযোগ্যতা, অথেনটিসিটিতেই তাঁর মনে জোরালো সন্দেহ জেগেছে। *লঘু-গুরুর* উত্তমকে বাংলা সাহিত্যে পতিতাদের পরিত্রাতা লেখক শরৎচন্দ্রও খুব পছন্দ করতে পারতেন বলে মনে হয় না। রাজলক্ষ্মী, বিজলীদের ছাঁচে তো উত্তম পড়েনা। কোনো আইডিয়ালিজম বা রোমান্টিকতার মায়া জগদীশ গুপ্তের চোখে কুত্রাপি নেই। তাঁর উত্তম যেমন ছলাকলায় নিপুণ বারবনিতা ছিল, তেমনি পরে ভাগ্যের উদারতায় কন্যা সহ একটি সংসার পেয়ে গৃহিনীপনা ও মাতৃত্ব উজাড় করে দিয়েছে। উত্তমের 'বাবু' বিশ্বনাথের মা'মরা মেয়ে টুকীর প্রকৃত মা হয়ে উঠেছে উত্তম। মাতৃত্বমহিমা উত্তমের মধ্যে যে অনায়াস সাবলীল ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে তা তুলনাহীন। আধা অনাথ এই শিশুটিই যেন উত্তমের সমাজের মূল স্রোতে ভাসবার ভেলা। বাচ্চা মেয়েটির জন্যই যেন স্থূল রুচির কদর্যমানুষ বিশ্বনাথের অশ্লীল সঙ্গ সহ্য করেছে উত্তম। কিন্তু জগদীশ গুপ্তের সৃষ্ট নারীরা সমকালীন পাঠকের মন পায়নি। তাদের পাঠক অচেনা মনে করেছে, এমনকি আন্তরিক দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথের মতো সংবেদী পাঠকও সেই দলেই পড়ে গিয়েছেন। বিষয়বস্তু ছাড়াও লেখকের লেখার ভঙ্গিটাই অচেনা লেগেছে সে যুগে। যা অবশ্যই লেখকের ইচ্ছাকৃত। প্রচলিত লিখনভঙ্গিকে তছ্‌নছ্‌ করে দেবার প্রেরণাজাত।

কথাসাহিত্যের আলোচনার তাত্ত্বিক পরিভাষায় এই অচেনা করে দেবার একটা গাল ভারি নাম আছে, defamiliarization। পাঠকের অভ্যাসকে, হোঁচট না খেয়ে এগিয়ে যাওয়াকে, পুরোনো জুতোতে পা গলানোর মতো অভ্যস্ত দৃষ্টিতে সমাজকে দেখে নেবার সহজ চলনে লেখক তাঁর মৌলিক রচনাভঙ্গি— যার মধ্যে অন্তঃসলিলা তাঁর নিজস্ব জীবনদর্শন এসবসহ এমনভাবে ঢুকে পড়েন যে অনভ্যস্ত পাঠকের মনে অনেক সময় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। জগদীশ গুপ্ত অনেক সময় এই ধরনের প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থার যে আপাতত শান্তিকল্যাণের প্রচ্ছদ তা টেনে ছেঁড়ার সময় তাঁর লিখনশৈলীও পাঠকের কাছে এক ধরনের অনভ্যস্ত অপরিচিত রূপ ধরে।

আমাদের দেশে শুধু নয়, সম্ভবত পৃথিবীর সর্বত্রই বিবাহ ব্যাপারটা সমাজে মানমর্যাদা নিরূপণের প্রধান মাপকাঠি। *গতিহারা জাহ্নবী* উপন্যাসে বাল্যবন্ধু

রাধাবিনোদের অপরূপা কন্যা কিশোরী শুধু সৌন্দর্যের জন্যই বধূরূপে গৃহীত হয়নি, রাধাবিনোদের 'ধনপ্রসিদ্ধি দেশব্যাপী'। এককথায় কিশোর যাকে বলে 'ট্রফি ওয়াইফ'। শুধু অকিঞ্চনের পক্ষে নয়, ভারতীয় সমাজে বরবধূর পারস্পরিকতার থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবার। সুতরাং জগবন্ধুর পরিবারের পক্ষে কিশোরী একটি মূল্যবান সংগ্রহ। এই ব্যাপারটি অনবদ্য একটি বাক্যে প্রকাশ করেছেন জগদীশ গুপ্ত 'দেশে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল— বৌ এনেছে জগবন্ধু।' এর পাশাপাশি *যথাক্রমে* উপন্যাসের বাপ মা হারা, সাবিত্রীর তুলনা করা যায়। সংসারে গরিব দাদা দীনবন্ধু ছাড়া সাবিত্রীর আর কেউ নেই। সাবিত্রীর রূপগুণ স্বভাবের জোরে সম্বন্ধ এসেছিল বটে, এবং বিশেষ কারণে হবু শাশুড়ি পরিষ্কার জানিয়েছিল, 'মেয়েটি সুশ্রী যদি হয় তবে টাকা আমরা চাইনে।' পাত্রের বাড়ির অবস্থা ভালো এতেই সাবিত্রীর দাদা দীনু বড়ো খুশি ছিল 'সাবিত্রী দুঃখের ঘরে মানুষ হইয়াছে, কিন্তু এইবার সে খাইয়া-পরিয়া সুখে থাকিবে।' পরে মেয়েটি শ্বশুরবাড়িতে সমবেত নির্যাতনের শিকার হয়। বিয়ের অল্পদিনের মধ্যেই বেত মেরে সাবিত্রীর পিঠ ফাটিয়ে রক্তপাত করেছে, তার স্বামীদেবতা। দীনু ছুটে গেছে এবং শুনতে হয়েছে তারা হাভাতে ঘরের মানুষ। বোনকে নিজের কাছে নিয়ে আসার চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়েছে। আসলে গরিব ঘরের মেয়েকে দাসী রূপে আনাই ছিল শ্বশুরবাড়ির অভীষ্ট। শিবুর দুটি ছোটো ভাই কালা আর মোনা— 'মায়ের দৃষ্টান্তের আর দাদার অগ্রাহ্যের ভাব দেখিয়া তাহারও গণ্ডীর বাইরে আসিল; মায়ের কথায় সায় দিতে দিতে এবং বৌদিদির বিরুদ্ধে তৈরী সাক্ষ্য দিতে দিতে একদিন তারা সেই রাজ্যে স্বায়ত্তশাসন লাভ করিয়া দুর্ব্যবহারে মাকেও ডিঙাইয়া যাইবার উপক্রম করিল।' স্বামীর শাসনের তো কথাই নেই, শিবরতনের সর্দি হলে তার পায়ে গরম তেল মালিশ করতে করতে ঢুলে পড়ার অপরাধে পতিদেবতা লাথি মেরে সাবিত্রীকে খাট থেকে ফেলে দেয়, খাঁচার পাখি তার অসাবধানতায় উড়ে গেলে পিঠে কঞ্চি মেরে মেরে অজ্ঞান করে দেয়।

> "তার খেলাই বন্ধ হইয়া গেল, শরীরের এবং প্রাণের। হাসিতে তার ভয় করে, কিন্তু কোন দিকেই তার রেহাই নাই। হাসিলে এলোকেশী বলে, ফাজিল; না হাসিলে সেই এলোকেশীই বলে, বিষমুখী, চট্ করিয়া কথা কানে গেলে বলে কানখরা; না গেলে বলে, কালা।"

সাবিত্রী কি এভাবেই জীবন কাটাল? না কি মরল শেষপর্যন্ত? কিছুই ঘটল না— শুধু জগদীশ গুপ্ত তার রূপান্তরটি দেখালেন। সেই রূপান্তর অদ্ভুত, এক হিসেবে কোমল, মাধুর্যময়ী সরল মেয়েটির একরকম মৃত্যু। অসুস্থ হয়ে একেবারে শুয়ে পড়ার পর সে আবিষ্কার করল পড়ে পড়ে মার খেয়ে কোনো লাভ নেই, তার শাশুড়ি শক্তের ভক্ত, নরমের যম। ফলত 'তাহার মনে হইল, এখানে কথার উত্তরে কথা কহিতে হইবে, শক্ত কথার জবাবে আরো শক্ত জবাব দিতে হইবে।'

পরের অংশটুকু গল্পের আরেকটি চরিত্র ভবেশের কাছে শোনা যাক, 'সে গাঁয়ে সাবিত্রীর নাম রটেছে 'কুঁদুলি' বলে। ...এখন সাবি আর সেই বাপের ঘরের পিট্‌পিটে মেয়েটি নাই। এখন শাশুড়ী যদি বলে এক কথা সাবিত্রী শোনায় তাকে দশকথা, শাশুড়ী যদি তোলে কঞ্চি, সাবিত্রী তোলে বাঁশ, পারুল ডাঙ্গার সবাই বলছে, বেটি জব্দ।'

সন্দেহ নেই ভবিষ্যতে সাবিত্রী তার শাশুড়ি এলোকেশীর থেকেও ভয়ংকর দজ্জাল ও নির্যাতনকারিণী শাশুড়ি হতে চলেছে। আখ্যানে কোনোই মিল নেই, তবু মার্কেজের সরলা এরেন্দিরা ও তার ঠাকুমার গল্প মনে পড়ে যায়। রূপান্তর প্রক্রিয়াতে নিষ্পাপ মেয়েটি দানবিক হয়ে ওঠে পরিবার ও সমাজব্যবস্থার চাপে।

সমাজ ও পরিবারের ফাঁস ব্যক্তিমানুষের গলায় কীভাবে চেপে বসে, তাকে কীভাবে হয় রূপান্তরিত, নয়তো নিরাশ্রয় করে ছেড়ে দেয় জগদীশ গুপ্ত তার ছবি অনেক এঁকেছেন। স্বভাবতই তাঁর সম্পাত প্রধানত পড়েছে মেয়েদের ওপর, কারণ তাদের উপরেই সমাজ ও পরিবারের থাবা নিরঙ্কুশভাবে গেড়ে বসে। পিতৃতন্ত্রের ভয়ানক আগ্রাসন— সম্পত্তি, পারিবারিক সম্মান, বংশধারা ইত্যাদি বিভিন্ন স্বার্থরক্ষার্থে অদৃশ্য হাড়িকাঠে মেয়েদের বলি দিয়ে চলে। জগদীশ গুপ্তকে মনে হয় এই বহমান সংকটই সর্বাধিক পীড়িত করেছে। সমাজজীবনের ঐতিহ্যমণ্ডিত নন্দিত ঘেরাটোপের আড়ালে কদর্যপ্রথা, অন্যায়, অমানবিক ব্যবহার যুগ যুগ ধরে চলে আসার ইতিবৃত্ত আঁকতে বসে অনপনেয় নৈরাশ্য তাঁকে আচ্ছন্ন করেছে। কোনো সময় প্রতিবাদ, কোনো প্রখর চৈতন্যের জাগরণ তিনি দেখতে পাননি তবু 'পয়োমুখমে'র ভূতনাথ বা *নিষেধের পটভূমিকায়*-এর শান্তির মতো কোথাও কোথাও প্রত্যাশার ঝিলিক আছে সন্দেহ নেই কিন্তু কূল ছাপানো অন্ধকারের মধ্যে তা আলোকবিন্দুবৎ। তাঁর সময়ে সমাজে মেয়েদের যে অবস্থান তার থেকে আমরা অনেক এগিয়ে এসেছি এইরকম ভেবে আত্মশ্লাঘা অনুভব করা যেতে পারে কিন্তু একেবারে সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানগুলি দেখলে সেই শ্লাঘার ফোলানো বেলুন একেবারে চুপসে যাবে। কন্যাভ্রূণহত্যা, শিশুকন্যাকে অবহেলা, মেয়েদের শিক্ষার শোচনীয় হার, মেয়েদের ওপর পারিবারিক নির্যাতন, পরিবারে এবং তার বাইরে শিশুকন্যা, বালিকা, কিশোরী, যুবতী থেকে যে কোনো বয়সের নারীধর্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের অগ্রগতি (পশ্চাৎগতি?) বিস্ময়কর, প্রায় প্রতিটি গ্রাফই ঊর্ধ্বমুখী। মাঝে মাঝে প্রেমিককে দিয়ে স্বামীকে অথবা স্বামীকে দিয়ে প্রেমিককে হত্যা করানোয় নিপুণ ও সক্ষম নারীরা অবশ্য সমাজের চোখ কপালে তুলে দিচ্ছে। যেন ধরেই নেওয়া হয়েছে মেয়েরা এ সব অপরাধ করতে পারে না। নরনারী নির্বিশেষে কিছু মানুষের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা, বিকৃত মনোবৃত্তি থাকতেই পারে— ছিলও সবসময়। তার বিবিধ কারণ থাকতে পারে— বিভ্রান্ত শৈশব বা কৈশোর, নির্যাতনের গুপ্ত ইতিহাস, পারিবারিক অথবা সমাজ-পরিস্থিতির চাপ, কিংবা কিছুই নয় একেবারে স্বয়ম্ভূ প্রবণতা। এই ব্যাপারে মানব ও মানবী একই মাপকাঠিতে বিচারযোগ্য।

শুধু মানবীকে দেবী বা শহিদ অথবা দানবী কোনো শিলমোহরেই পুরো আটকে দেওয়া অর্থহীন। জগদীশ গুপ্ত কখনোই কোনো নীতিবাদী বা ভাববাদীর চোখ দিয়ে নারীকে দেখেননি। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিকতার জগদ্দল কীভাবে নারীর দমবন্ধ করে দিচ্ছে তিনি তার কথাকার। তাঁর লেখায় বস্তুনিষ্ঠতা এতোটাই একাগ্র, এতোটাই নির্মম যে সরলমতি পাঠক পড়তে পড়তে যেন হাঁপিয়ে ওঠে, বিশ্বাস না করতে পারলেই বাঁচে। আয়নায় নিজেব মুখ দেখতে ভয় পাওয়ার মতো।

আমাদের মনে পড়ে যাবে তাঁর গল্পের সাতকড়ি ও মাখনের কথা। ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে জেল খেটেছে সাতকড়ি। মুক্ত হয়ে বাড়ি ফেরার পর এমনতরো স্বামীর সান্নিধ্য ও শয্যাসঙ্গের ভাবনা স্ত্রী হিসেবে মাখনকে বিবমিষাময় শারীরিক ও আত্মিক সংকটে ঠেলে দিয়েছিল। কাছাকাছি অপরাধের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রমর স্বামী গোবিন্দলালকে ত্যাগ করেছিল। কিন্তু সবাই ভ্রমরের মতো ধনী ঘরের কন্যা, স্বয়ং ধনী এবং সিদ্ধান্তগ্রহণে স্বাধীন নয়। মাখন কিন্তু তার অসম্মতি জানাতে দ্বিধা করেনি— এই সাহসের জন্য শাশুড়ির ক্রুদ্ধ ধাক্কায় মাঝরাতে তাকে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। পরিবারে নারীর অবস্থান কতটা নড়বড়ে তার বীভৎস এই দৃষ্টান্তের পাশেই 'চন্দ্রসূর্য যতদিন' গল্পের সন্তান কোলে স্বামীশয্যা বঞ্চিত উন্মাদিনী বধূটিকে রাখা যায়। সম্পত্তি এক ও অবিভাজ্য রাখার জন্য বাবা দুই বোনকে একই পাত্রের গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছেন— তারপর সন্তানবতী অগ্রজা ও সদ্য যৌবনবতী অনুজার মধ্যে চাপা যৌন ঈর্ষা— স্বামীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য নীরব প্রতিযোগিতার অশ্লীলতা এবং পরিণামে অগ্রজার মানসিক বিকারগ্রস্ততা কী অদ্ভুত সংযমে জগদীশচন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে ভবানন্দ মজুমদারের দুই স্ত্রী চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখীর প্রায় একইরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে কী রগড় ফেঁদেছিলেন ভারতচন্দ্র। একটু মনে রাখা যাক, *অন্নদামঙ্গল* লেখা হয়েছিল 'রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়।' অর্থাৎ ভবানন্দ মজুমদারের ঐ দুই স্ত্রী একদা যে রাজপরিবারের অন্তর্গত ছিলেন তারই এক বিখ্যাত উত্তর পুরুষের আজ্ঞায় 'ভারত সরস ভাষে'। বিখ্যাত সব বংশতালিকায় যেমন নারীর স্থান হয়নি, শুধু গর্ভধারণই সার— তেমনি রাজসভার কাব্যে, সেই রাজপরিবারের পূর্বকালের অপমানিত বধূদের নিয়ে এবম্বিধ রসিকতা রাজা ও তাঁর সভাসদদের কাছে খুবই আমোদজনক হয়েছিল সন্দেহ নেই। ব্যাপারটা চিন্তা করলে পাঠকের রুচিবোধ পীড়িত হয়।

জগদীশ গুপ্তের রচিত বেশ কিছু গল্প উপন্যাস পড়তে গেলে মনে হয় আমাদের পরিবারে, সমাজে, লোকচর্চায় নারীর নিরন্তর অবমাননা ও লাঞ্ছনা এবং এ ব্যাপারে সমাজের সামূহিক জড়ত্ব তাঁর লেখকচৈতন্যের তাঁর রুচিবোধের পক্ষে বড়ো কষ্টকর ও পীড়াদায়ক ছিল। নানাভাবে সেই যন্ত্রণা, সামাজিক ভারসাম্যের সেই বিচলন তিনি প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছেন— তাই তাঁর ওপর সিধে সাপটা 'নারীদরদী' ছাপ দেওয়া সম্ভব

হয়নি। তাঁর কলম পিতৃতন্ত্র ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের গোড়ায় আঘাত করেছে— শুধু দরদ দেখিয়ে ক্ষান্ত হওয়ার মতো নির্বিষ লেখক তিনি নন।

দুই

অকিঞ্চনের স্ত্রী কিশোরীর অনুপম রূপলাবণ্য, পিতৃদত্ত অপরিচিত যৌতুক ছাড়াও চারিত্রিক নির্মলতা ও শ্রী তাকে একটি অনন্যতা দিয়েছিল, শ্বশুরবাড়ির গ্রামের কেউই তাকে সাধারণ ভাবেনি একমাত্র তার স্বামী ছাড়া। তাসের আড্ডা, গল্পের মজলিশ, গানের বৈঠকে এবং আরো নানাবিধ অশালীন হুল্লোড়ে মত্ত অকিঞ্চনের কাছে স্ত্রীকে বাড়তি কিছু একটা মনে হয়নি। অকিঞ্চনের বন্ধুরাই এমন পুরুষের পাশে কিশোরীর মতো স্ত্রীরত্নকে 'বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার!' হিসেবে অভিহিত করেছে। কিশোরীর মুখের হাসি কিংবা হাতের ছোঁয়ার মাধুর্য ও রহস্যময়তা অনুভব করার কোনো শক্তিই অকিঞ্চনের ছিল না।

"মনের কোন্ কথাটা আবরণ দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে বেশী করিয়া ফোটে, কোন্ কথাটার জবাব দিতে গিয়া সেই কথাটাই ভুলিয়া যাইতে হয়, কোথায় অকারণ কথাটাই গোপন কারণে ভরপুর হইয়া দেখা দেয়, এইসব নিগূঢ় ব্যাপার ঘটোৎকচের শাস্ত্রজ্ঞানের মত অকিঞ্চনের অন্তরলোকের একেবারে বাহিরে। তার মনে যেমন ক্রীড়াশীলতা নাই, তেমনি ব্রীড়াময়তাও নাই, উহাদের অভাবে সে অন্ধ।"

কিন্তু কোনো কোনো ব্যাপারে তার চোখ আশ্চর্যরকম খোলা বৈকি, বাসরঘরে কিশোরীর ঠিক পাশে বসেছিল যে সুনয়না সইটি, তাকে লক্ষ্য করতে অকিঞ্চনের দেরি হয়নি। এবং অপরা নামে সেই মেয়েটির প্রতি তার মনে যৌন আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছে। সে এমনভাবে কিশোরী আর অপরাকে মনে পাশাপাশি বসিয়ে তৌল করেছে যেন এরা দুটি পণ্যদ্রব্য।

"ইহার অর্থাৎ স্ত্রী কিশোরীর বর্ণ উজ্জ্বল বেশী, তাহাতে অসাধারণত্ব কিছু নাই, কিন্তু তার অর্থাৎ স্ত্রীর সই অপরার চক্ষু দুটি অতি কোমল, ঢলঢল, এমন অসাধারণ যে, এই শহরে কই তেমনটি তো দেখা যায় না।"

স্ত্রী তো হাতেই আছে, অপরাকে একদিনের জন্যও হস্তগত করা গেলনা কেন ভেবে অকিঞ্চন ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এমনি তার লালসা যে বন্ধুদের কাছেও সে প্রাণ খুলে ব্যক্ত করে কিশোরীর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে অপরার সঙ্গে বিয়ে হলে আক্ষেপের কিছু থাকত না। বন্ধুরা তাকে বুদ্ধিতে আর আদিরসে অজরাজ বা পাঁঠাপ্রধান বলে সম্বোধন করে তবু তার লজ্জা বোধ হয় না। তার পরস্ত্রী মুগ্ধতার কথা অবশ্য চাপা থাকেনা, গ্রামের চর্চাবিলাসী রসনায় গল্পটি পল্লবিত হতে থাকে—

"গ্লানিকর এ অবস্থায় অপর লোকের বোধ হয় মাথা হেঁট হইয়া যাইত, কিন্তু

অকিঞ্চনের সবই বিপরীত— তার পুলক স্ফূর্তি দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। ... যে কারণে তাহা ঘটিল তাহা যেমন কদর্য্য তেমনি গভীর। যাহার সঙ্গে তাহাকে জড়াইয়া এই আলোড়ন সুরু হইয়াছে সে পরনারী। অপবাদের নামেই শুধু নামের সূত্রে অকিঞ্চনের দেহ আর মনের পরনারী লোলুপতা একপ্রকার তৃপ্তি লাভ করে।"

মনস্তত্ত্বের মতে এই বিকার চিকিৎসাযোগ্য। এমনকি কিশোরীর সামনেও সে সগৌরবে সেইসব অতিপল্লবিত কলঙ্ককথা বাখানিয়া বলে এবং কুৎসিত আনন্দ পায়। তাই স্বামীর সঙ্গে পিতৃগৃহে যাবার সময় কিশোরীর পা ওঠে না। সই অপরা এখনো সেখানে— 'লোকচক্ষুর সম্মুখে স্বামীর ইতরতা যদি উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়ে। ... পিতৃকুলের মাঝে স্বামীকে কল্পনা করিয়া কিশোরীর প্রাণ ধড়্‌ফড় করিতে লাগিল, স্বামীর হৃদয়ের বীভৎসতা আগে যেন এত পরিস্ফুট হইয়া তার চোখে পড়ে নাই।' শ্বশুরবাড়ি যাবার পর যথারীতি পরিতৃপ্তিপূর্বক ভোজনের অবসানে স্ত্রীর হাত থেকে পান নিতে নিতে অকিঞ্চন প্রশ্ন করে বসল, 'তোমার সইকে দেখলাম না ত?' আর সহ্য করতে না পেরে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে কিশোরী মাকে বলে ফেলল, 'তুমি ওঁকে আজই যেতে বলো।' এই ক্ষমার অযোগ্য বাক্য অকিঞ্চনের কানে যাবার ফলে নাটকীয় অনেক ব্যাপারই ঘটল। স্বামীর মর্যাদা, পৌরুষের অহংকার, জামাইয়ের সম্মান— এ সব অকিঞ্চন কিছু কম বুঝত না। তার তৎক্ষণাৎ নিজের বাড়ি ফিরে যাবার ঘোষণা— শ্বশুর শাশুড়ির পায়ের তলার মাটি কাঁপিয়ে দিল। তাঁরা তো ক্ষমা চাইলেন তাতে অকিঞ্চনের তেজ ভাঙল না, অবশেষে 'মায়ের শিক্ষামত কিশোরী অকিঞ্চনের পায়ের উপর কপাল ঠুকিয়া ক্ষমা চাহিল।' দেবতা দয়া করে অবস্থান করলেন। এই ঘটনায় অকিঞ্চনের মনের যে রূঢ়, অসংস্কৃত, কর্কশ চেহারা রাধাবিনোদ ও হেমশশীর কাছে ধরা পড়ল তা দুশ্চিন্তা করার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু সে আলোচনা না করে সমস্যাটিকে ধামাচাপা দেবার কৌশল ভারতীয় পারিবারিক ঐতিহ্যে সুপ্রাচীন।

এখানেই কিশোরীর অপমান শেষ হলে হিন্দু কল্পনার পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর মতো মহিমাময়ী কন্যাটি গতিহারা হত না। জগদীশ গুপ্ত তাঁর নায়িকাকে মেরুদণ্ডহীন জড়পুতুলবৎ করেননি। পায়ে ধরে ক্ষমা চাইলেও 'পরস্ত্রীর প্রতি স্বীমার এমন নির্লজ্জ লুব্ধতা আর লোভের এমন বর্ব্বর প্রকাশ' সহ্য করতে সে রাজি ছিল না।

> "— আমায় তুমি ছুঁয়ো না। — বলিয়া প্রাণপণে দেহ সঙ্কুচিত করিয়া কিশোরী সরিয়া গেলে অকিঞ্চন সকৌতুকে জানিতে চাহিয়াছিল, অপরাধ?
>
> কিশোরীর মনে থাকিলেও মুখে সে বলতে পারে নাই, "তুমি অপবিত্র। আমার আঙ্গস্পর্শ করিবার স্পর্দ্ধা তোমার কেন হইবে?"

এই প্রতিরোধ অবশ্য কার্যকরী হয়নি তার ইঙ্গিত উপন্যাসে আছে। মাত্র একবার সন্তর্পণে অতি নম্রভাবে কিশোরী তার পিতামাতার কাছে অনুযোগ করেছিল তার বিয়ের

আগে পাত্রের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁরা যথাযথভাবে খোঁজ নেয়নি। তার মতো শান্ত ভদ্র পরিশীলিত মেয়ের পক্ষে আর কতদূর বলা সম্ভব।

তিন

অকিঞ্চন এমন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠল কেন, তার ইতিহাসে জগদীশ গুপ্ত সংগুপ্ত রেখেছেন আরেকটি ধিক্কার— আমাদের সমাজে পুত্র কামনার উদগ্রতা এবং পুত্রলাভে আত্মহারা হয়ে ধন্য হয়ে যাবার দীনতা।

> "প্রতিবেশীরা বলে, ছেলের মাথা তোমরাই খেয়েছ। ... অকিঞ্চন তাঁহাদের বড় আরাধনার ধন, তাঁহাদের দীর্ঘ দস্তুর দ্বাদশবৎসরব্যাপী তপস্যার ফল ঐ পুত্র অকিঞ্চন; তাঁহাদের তপস্যার তুষ্ট হইয়া দ্বাদশ বৎসর পরে দেব অকিঞ্চননাথ ঐ পুত্রবর দিয়াছিলেন, সন্তানহীনতা দম্পতীর ম্রিয়মাণ রসহীন দীর্ঘজীবনের পর ঐ পুত্র, যে উল্লাস পরিপূর্ণতা আর সার্থকতায় দেব অকিঞ্চননাথ তাঁহাদের জীবন সেদিন আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা ত ভুলিবার নয়।"

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অপরিমিত প্রশ্রয়ের ফলে অকিঞ্চন যখন একেবারে লাগামছাড়া হয়ে উঠল তখন সংশোধনী কার্যক্রম শুরু হল, বিপথগামী পুত্রকে সুপথে ফিরিয়ে আনতে পারে একমাত্র একটি সুন্দরী স্ত্রী। এই হাতুড়ে চিকিৎসাও বহু প্রাচীন। একটি বিবাহ মানব মানবীর জীবনে সব সমস্যার সমাধান করতে পারে এটি আমাদের সমাজে বদ্ধমূল সংস্কার। শুধু চরিত্রহীনতা নয়, পাগলামি, মৃগী, হিস্টিরিয়া এবং নানা ধরনের যৌন অসুখও বিয়ে দিলেই সারবে এই ধারণা নিয়ে গাঁটছাড়া বেঁধে দেওয়া হয়। অকিঞ্চনের বাবা জগবন্ধু আপন পুত্রের স্বভাবচরিত্রের কথা যে বাল্যবন্ধু ও ভাবী বৈবাহিকের কাছে চেপে গিয়েছিলেন তা বলা বাহুল্যমাত্র। বিয়ের আগে অবশ্যই বলা হয়নি যে বাগদী পাড়ায় অকিঞ্চনের যাতায়াত বহুদিনের। বিয়ের পর নিজের কোনো অভ্যাসই সে ত্যাগ করেনি— এটিও নয়। একটি মাত্র স্ত্রীর আঁচলে বাঁধা হয়ে থাকা তার কাছে প্রকৃতই হাস্যকর। চম্পা, পাঁচি প্রভৃতি বাগদীপাড়ার প্রগল্‌ভা নারীদের সঙ্গে অকিঞ্চনের ছিল দৃষ্টিকটু ঘনিষ্ঠতা। তারা তার 'গা ঘেঁষে বসে, মন লুটিয়ে দেয়, কিন্তু অকিঞ্চনের দুর্লভ বস্তু করায়ত্ত করার লালসা প্রবল। তার নজর ঐ পাড়ার রূপসীশ্রেষ্ঠা ভুবনেশ্বরীর উপর। যার 'রূপ আছে দেহে, গাম্ভীর্য্য আছে মুখের অবয়বে আর তেজ আছে মনে, ওদের কেহ তাহাকে বুঝিতে পারে না।' এই প্রসঙ্গে আমাদের সমাজের আরেক জঘন্য দ্বিচারিতা লেখক প্রকট করেছেন। বাগদীরা অস্পৃশ্য বর্ণহিন্দুর কাছে, কিন্তু তাদের নারীদের ভোগ করায় কোনো বাধা নেই বরং তা শ্রমজীবী মানুষের শ্রমের সঙ্গে তাদের নারীদের শরীরের উপর উচ্চবর্ণের স্বীকৃত অধিকার।

যদিও বাগদী পুরুষদের যেভাবে জগদীশ গুপ্ত শ্রমবিমুখ, শামুকের মত অলস, তাস

বা আড্ডায় মগ্ন, নানাবিধ নেশায় পটু একান্ত অপদার্থ হিসেবে চিত্রিত করেছেন তা তাঁর সমাজদৃষ্টির মধ্যবিত্ত সীমাবদ্ধতার পরিচয় দেয়।

'জানিত কোন উপজীবিকা ইহাদের আছে বলিয়া মনে হয় না, অথচ তেলে-জলে বেশ মসৃণ নধর দেহ, চুলে সরু পাতা কাটা, কারু তেরী, কারু সিঁথি। ... বাগদীপাড়ার রাতের মূর্ত্তি বড় বীভৎস; পুরুষের জীবনব্যাপী শ্রমবিমুখতার মূলে আছে রাতের অন্ধকারে আচ্ছাদিত একটি ব্যাপার।' — এই সাধারণীকরণ অবশ্যই আপত্তিযোগ্য। বাগদীরা মূলত সমাজ ব্যবস্থার কলাকৌশলে ভূমিহীন ফলে কৃষিতে তাদের স্থান নেই, উচ্চবর্ণের প্রয়োজনেই তাদের বাহুবলকে বারম্বার ব্যবহার করা হয়েছে। জমিদাররা নিজেদের মধ্যে অবিরত সংঘর্ষে বা অবাধ্য প্রজাদের শায়েস্তা করতে বাগদী লেঠেল, পাইকদের ব্যবহার করেছে চিরকাল। খুবই কৌশলে নির্মিত সামাজিক নকশায় কয়েকটি সম্প্রদায়কে নির্জিত ও নির্ভরশীল রাখার শঠ পরিকল্পনাটি জগদীশ গুপ্তের মতো লেখকের চোখ এড়িয়ে গেল দেখে পাঠক কিঞ্চিৎ হতাশা বোধ করে। অবশ্য তিনি সামাজিক ইতিহাস লিখতে বসেননি, তাই তাঁর বাগদী পাড়ার ব্যাপারে বিশদ হবার দায় নেই। তাঁর লক্ষ্য ব্যক্তিমানুষের অর্থাৎ কিশোরীর ট্র্যাজেডি। অকিঞ্চন ও পাড়ার মেয়েদের মিলিত ষড়যন্ত্রে লাঞ্ছিত ভুবনেশ্বরী যখন নিরুপায় হয়ে দুঃসাহসিক ভাবে জগবন্ধুর অন্তঃপুরে ঢুকে পড়ে, তখন অকিঞ্চনের মা কাত্যায়নী তাকে দূর করে দেবার যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু শাশুড়ির জ্বলন্ত রোষদীপ্ত দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে কিশোরী বলতে পেরেছে,

> "আপনার ঢাকতে যাওয়া বৃথা, আমি বুঝেছি সব; তবু পরের মুখে শুনে নি, কতটা আমায় সইতে হবে।"

ভুবনের মুখেই শোনা গেল অকিঞ্চনের বাদগীপাড়ায় প্রেয়সীদলের কথা, বিশেষ করে ভুবনের প্রতি তার কামুক দৃষ্টির কথা, পাড়ার ঈর্ষাকাতর মেয়েদের ষড়যন্ত্রে ভুবনকে ঘরে বন্ধ করে রেখে অতঃপর অকিঞ্চনের আগমন এবং সম্ভাব্য ধর্ষণকারীকে মেরে ধরে ভুবনের পালানোর কথা।

মাখনের শাশুড়ির মতো কাত্যায়নী কিশোরীকে ধাক্কা দিয়ে ঘরের বার করেননি, তিনি তেমন মানুষ নন, তবে গম্ভীরভাবে আদেশ করতে পেরেছেন, 'বৌমা, চান করো। বাগদীমাগীকে ছুঁয়েচ।' এই পুত্র স্নেহে অন্ধ, আচার মোহে অন্ধ, একান্ত সমবেদনাহীন কর্কশ আদেশের উত্তরেই কিশোরীর নীরব প্রতিক্রিয়ায় জগদীশ গুপ্ত এই উপন্যাসের সবচেয়ে ধারালো বাক্য'কটি রেখেছেন,

'তারপর মনে হইল তার বলে,— জননী, কতবার কতজলে স্নান করিলে তোমার পুত্র শুচি হইতে পারে? কিন্তু বলিল না; বলিল না ঘৃণা করিয়া, বাক্যব্যয়ের অরুচিতে।'

'পয়োমুখম্' গল্পে কিংবা *মহিষী* উপন্যাসে শাশুড়ি এবং বধূর সখ্য, নারী হয়ে নারীর

মনোবেদনা অনুভব করার ছবি জগদীশ গুপ্ত আশ্চর্য কুশলতায় এঁকেছেন। *গতিহারা জাহ্নবী*তে বাহ্যত ততোটা সখ্য নেই। কিন্তু স্বামী সঙ্গের গ্লানি থেকে বাঁচার জন্য কিশোরী যখন পিত্রালয়ে ফিরে গেছে কাত্যায়নী বাইরে নির্লিপ্ত অন্তরে দ্বিধান্বিত থেকেছেন, জগবন্ধু অবশ্য শ্বশুর হিসেবে বিদ্রোহিনী বধূর পিতার উদ্দেশ্যে দশজনের সহযোগিতায় চরমপত্র পাঠিয়েছেন। 'এই চিঠিটি জ্যোতির্ময়ীদেবীর আত্মজীবনী স্মরণ করিয়ে দেয়, বালিকাবধূকে পিতৃগৃহে না পাঠানোর অজুহাত হিসেবে জ্যোতির্ময়ীর শ্বশুরবাড়িতে আত্মীয় স্বজনের সাহায্যে রচিত চিঠিতে বিয়ের দানসামগ্রীর নিন্দা ও বধূর সহবতহীন চলনবলনের নিন্দা উপচে পড়েছিল। জগবন্ধুও জানিয়েছেন হিন্দু স্ত্রীতে আর একটু সহ্যগুণ দেখার আশা তাঁরা করেছিলেন, ম্লেচ্ছাচার যেসব পরিবারে প্রবেশ করেছে 'মেয়েরা সেখানে ধর্ম্মশিক্ষা তো পায়ই না, সেখানে তাহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞানই বিকশিত হয়না।' কিশোরীর বাবা প্রত্যুত্তরে জানিয়েছেন 'তাঁর কন্যাকে তিনি চিরকুমারী' মনে করবেন। কিন্তু কিশোরীর মা হেমশশী এই উত্তরে বাধা না দিলেও মনে মনে যা ভেবেছেন তাতে জগদীশ গুপ্তের চাবুক আবার আমাদের 'বরণীয়' ঐতিহ্যের ওপর মোক্ষম ভাবে আছড়ে পড়ে।

> "স্বামীর চরিত্রগত অসাবধানতা ক্ষমার চক্ষেই দেখিতে হয়, কারণ নরকের দ্বার নারীর জন্য যত তৎপরতার সহিত উন্মুক্ত হইয়া যায়, পুরুষের বেলায় তত নয়। এই নিয়ম আর উপলব্ধি সংসারের লোকের একান্ত পরিচিত আর চির-আচরিত জিনিষ, এবং কল্যাণপ্রদ বলিয়া শ্রদ্ধেয়ও বটে।"

স্বভাবতই এর পরে ছেলের আবার বিয়ে দেবার হুমকি এল, কিশোরী হয়তো অপরিসীম হতাশা, শূন্যতা আর নিঃস্বতার চাপেই এবার একখানি চিঠিতে অকিঞ্চনকে জানাল কোন অপরাধে অকিঞ্চন তাকে ত্যাগ করবে তা সে জানতে চায় এবং 'তুমি ভাল না হইলে তোমার কাছে আমি যাইব না।' শেষ বাক্যটি উপেক্ষিত হল মেয়েলি অভিমান হিসেবে— পত্রটির ব্যাখ্যা দাঁড়াল বধূ আবার স্বামীগৃহে ফিরতে চায়। একমাত্র কাত্যায়নীর মনেই বাক্যটির তাৎপর্য ধরা পড়েছিল— এবং তাঁর দ্বিধা ও সন্দেহ ছিল। বাঙালি পরিবারে শাশুড়ি-বধূর মতো সাপে-নেউলে সম্পর্ক বিষয়ে যে মিথ প্রবল শক্তিশালী, জগদীশ গুপ্ত বরাবরই তা ভেঙেছেন। 'মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু' ইত্যাকার জনপ্রিয় লোকবাক্যে যে সমাজ আস্থা রাখতে ভালবাসে তার কাছে এই লেখককে অচেনা মনে হবেই।

অকিঞ্চন যখন বাগদীপাড়ার প্রেয়সীদের কাছে 'তোরা আমার আটপৌরে ঘর, সে থাকবে পোষাকী' এই সত্যভাষণে গদগদ তখনি কিশোরীর না আসার খরবটা তার পক্ষে কিঞ্চিৎ হতাশজনক হয়েছিল, কিন্তু উপন্যাসের পাঠক জানে সন্তানসম্ভবা কিশোরীকে শেষপর্যন্ত ধর্ষকাম স্বামীর কাছে ফিরতেই হবে। তুলনা হিসেবে *যোগাযোগে*র কথা

আমাদের মনে পড়বেই, সেখানেও মধুসূদনের সঙ্গে অরুচিকর দেহসংসর্গে গর্ভবতী কুমুকে ঘোষালবাড়িতে ফিরতে হয়েছিল শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে মধুসূদনের ক্লেদাক্ত সম্পর্কের কথা জানবার পরেও।

যোগাযোগের সঙ্গে আরেকটা মিল একটু অন্যধরনের। চাটুজ্যেরা ছিল ঘোষালদের চিরশত্রু, কিন্তু ঘটনাচক্রে পরে বিপ্রদাস চাট্যুজ্যে মধুসূদন ঘোষালের ঘাতক। জেনে বুঝে চিরশত্রু এবং উপরন্তু মহাজনের সঙ্গে বোনের বিবাহ দিয়েছে বিপ্রদাস। নিজের পিঠ বাঁচানোর তাগিদ যে এতে ছিল না তা বলা যায় না। চাটুজ্যেদের স্থাবর সম্পত্তিতে কুমুর কোনো অধিকারের কথা উপন্যাসে বলা হয়নি। পিতৃগৃহে রয়ে গেলে তাকে দাদাদের গলগ্রহ হয়েই থাকতে হত।

কিশোরীর পিতা ধনী, দাদা গণপতি কলেজে পড়ে। সে দেশভক্ত, নিরপেক্ষ, স্বল্পভাষী, সদ্‌গুণান্বিত। কিন্তু কিশোরীর চিরকাল পিতৃগৃহে থাকার সম্ভাবনায় তার মা হেমশশীর মনে এমন উপযুক্ত পুত্র ও তার অনাগত স্ত্রীকে নিয়েই সংশয় দেখা দিয়েছে।

> "গণপতি তখন হইবে গৃহকর্তা, তার স্ত্রী হইবে গৃহিণী; অর্থাৎ কিশোরীকে তখন উহাদের অধীনে থাকিতে হইবে, দাদা ও বৌদির অধীনে থাকাটাই যদি কিশোরী তখন নির্যাতন মনে করে! সত্যই যদি নির্যাতন শুরু হইয়া যায়!"

উচ্চশিক্ষিত 'সদগুণান্বিত' গণপতি ও এই সম্ভাবনাটি উড়িয়ে দিতে পারেনি, তাছাড়া 'কিশোরী যে পরের কাছে আমরণ হাত পাতিয়া থাকিবে ইহাও অসাধারণ ক্লেশের কথা, উভয়তঃই। সুতরাং এখানেও সম্পত্তিতে কিশোরীর কোনো অধিকারের কথা উঠছে না। শ্বশুরবাড়ি না গেলে পিতৃগৃহে তাকে পরে দাদা বৌদির গলগ্রহ হয়েই থাকতে হবে। মেয়েদের উভয় পরিবারে দাঁড়াবার জায়গাটি যে কত পলকা ও পরগাছার মতো তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে *যোগাযোগ* ও *গতিহারা জাহ্নবী* দুটি উপন্যাসেই। কুমু ও কিশোরী দুজনেই অবাঞ্ছিত সন্তানের জন্ম দেবে, ফিরে যাবে নরকসদৃশ পতিগৃহে এই সাদৃশ্য ছাড়াও, পিতৃগৃহে তাদের আপাত সমাদরের তলায় একই রকম নিরাশ্রয়তা বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশ গুপ্তের মধ্যে যথেষ্ট চিন্তাসাম্য রয়েছে অথচ অপরিচয়ের আঁধার রয়ে গেল। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য *পুরাতন প্রসঙ্গ* গ্রন্থে বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন, 'মেকলে স্থলবিশেষে বলিয়াছেন যে, যাঁহারা অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন লেখক তাঁহারা পরের লেখা বিষয়ে ভাল সমালোচক হয়েন না— 'Great authors are seldom good critics.'

জগদীশ গুপ্ত, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অবশ্যই জীবনানন্দ দাশ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকৃত সমালোচনা মাথায় রেখে কি আমরা ভয়ে ভয়ে কৃষ্ণকমলের বক্তব্যটি আবার একটু পড়ে নিতে পারি?

চার

আমাদের পরিবার ও সমাজে মানুষের সার্থকতা নির্ভর করে আর্থিক প্রতিপত্তি ছাড়াও সন্তান লাভে, বিশেষত পুত্র সন্তানলাভে। গোটা পৃথিবীতেই এই ঝোঁক আছে, তার পিছনে জৈবিক কারণ অবশ্যই প্রধান, তাছাড়া আছে পিতৃতন্ত্রের প্রবল দাপট। গর্ভস্থিত সন্তান সম্বন্ধে কিশোরী ভেবেছে, "স্বামী যাহা অকাতরে দান করিয়া ইহকাল ও পরকালব্যাপী কলুষ মর্ম্মে আত্মায় পুঞ্জীভূত করিয়াছিল, এই সন্তান সেই অশেষ কলুষজাত, ইহা শুভ নহে, সার্থক নহে, ঈপ্সিত নহে, ইহা অবাঞ্ছিত এবং বর্জনীয় কলুষ।' *দয়ানন্দ মল্লিক* উপন্যাসে জগদীশ গুপ্ত ছাঁচে ঢালা শাশুড়ি কামিনীকে দেখিয়েছেন। ছেলে ভুবনেশ্বরের চোদ্দ বছরে সে বিয়ে দিয়েছে নয় বছরের মল্লিকার সঙ্গে। তার মতামত অস্পষ্ট এই অপবাদ কেউ দেবে না। 'আমি ত' বৌ দেখাতে বৌ আনি নাই আমি চাই নাতি। ... আমি ভাবছি যদি বৌ বাঁজা হয়, ছেলে যদি না হয়! তখন আমি কি করব!' মল্লিকা ম্যালেরিয়ায় চূড়ান্ত অসুস্থ থাকার সময়েই বোঝা গেছে সে অন্তঃসত্ত্বা।

'গৃহস্থবধূর সন্তানসম্ভাবিতা হওয়া সকলের সঙ্গে তার নিজের পক্ষে ও একটা যুগান্তকারী তুমুল ঘটনা— তৃপ্তি আকাঙ্ক্ষাপূরণ, নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ আর উল্লাস উৎসবের ব্যাপার ত বটেই। ... কামিনীর পক্ষে ত' তা' চরম। মানুষের আনন্দ উপভোগ করিবার মানবসুলভ ইচ্ছার উপরে আর একটা স্থান আছে— সেটা পশুস্তর। কামিনীর আনন্দ সেই পশুস্তরের— 'মল্লিকাকে সন্তানসম্ভাবিতা দেখিয়া সে পাশবিক উল্লাসে নৃত্য শুরু করিয়া দিল। ছেলে পেটে আসিতেছে না বলিয়া কামিনী বউকে কঠিন কথা শুনাইত— বলিত বাঁজা, ধুমসী।' নীরক্ত দেহে মল্লিকা সন্তান বহন করে চলল আর সাত মাসের শেষে প্রসব করল একটি অপুষ্ট মৃত সন্তান। মৃত সন্তানটি পুত্র জেনে কামিনী 'উঠানে ঠাস হইয়া পড়িল। ... বধূকে সে আর চাহে না— পুত্রবধূকে লইয়া আহ্লাদ করিবার সাধ তার ঘুচিয়াছে; বধূ মানবী নয়, রাক্ষসী— রাক্ষসী পেটের ছেলেকে ভক্ষণ করিয়াছে— দ্বিতীয়া একটি বধূকে সে অবিলম্বেই আনিবে; পুত্র প্রসব করা এ বধূর কর্ম্ম নয়; এ বধূ যদি এখনই মৃতুমুখে পতিত হয় তবে সে কালীঘাটে যাইয়া মাকে যুগল ছাগের রক্ত দান করিবে।'

সমস্ত ব্যাপারটির বীভৎসতা পাঠককে শিহরিত করে; কিন্তু আজও একুশ শতকে দাঁড়িয়ে এটি আমাদের সামাজিক সত্য, তার প্রমাণ প্রতিদিনের সংবাদপত্রের অসংখ্য রিপোর্ট। তবে 'দাম্পত্য স্বত্ব সাব্যস্তপূর্ব্বক স্ত্রী দখলে'র মামলা ১৯৫৫ সালের হিন্দুকোড আইনের পর আর সম্ভব নয়। মল্লিকাকে বাধ্যতামূলক ভাবে পতিগৃহে ফেরাবার জন্য 'উপচিকীর্ষ' গ্রামীণ সমাজ সচেষ্ট হয়ে উঠেছিল কিন্তু হাকিমের আশ্বাস বাক্যের পরও কাঠগড়ায় হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে মল্লিকা যা বলেছিল, তা ভারতবর্ষের মতো দেশে যেখানে মা হওয়াতেই নারীজন্মের সার্থকতা, মাতা যেখানে স্বর্গাদপি গরীয়সী, (অন্তত মৌখিকভাবে) মাতৃমহিমা যেখান স্মরণাতীতকাল থেকে

অশেষরূপে বিজ্ঞাপিত সেই 'পুণ্য' ভূমিতে দাঁড়িয়ে জগদীশ গুপ্ত কোন সাহসে লিখেছিলেন ভাবলে অবাক লাগে।—

"অসুখের সময় ছেলে পেটে এসেছিল; মরতে বসেছিলাম। এ শরীরে আমি আর ছেলে চাইনে— ছেলে আমি পেটে ধরতে পারব না। রক্ষে করো আমাকে তোমরা।"

মা হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে যে মেয়েদের নিজস্ব ইচ্ছের মূল্য সবচেয়ে বেশি, নিজের শরীরের ওপর মেয়েদের নিজস্ব দাবি ও অধিকার যে নিরঙ্কুশ হওয়া দরকার— মেয়েরা যে পতিগৃহে অনবরত এক শরীর-রাজনীতির শিকার তা এভাবে জগদীশ গুপ্তের সময়কালে আর কোনো লেখক অনুভব করেছেন বলে মনে হয় না।

'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' কিংবা 'পুন্নাম' নরকের সাতকাহন জনচিত্তে এমনভাবে গাঁথা হয়ে আছে যে এ দেশে কন্যাভ্রূণ হত্যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে ত্রাসসঞ্চারক রূপে বর্ধমান। তবে পুত্র না হলে অগত্যা কন্যা— সন্তানই সর্বার্থ সাধক। কিন্তু প্রকৃতই কি মানবজীবন শুধু বংশবিস্তারেই সার্থক? *গতিহারা জাহ্নবী*তে জগদীশ গুপ্ত এই প্রশ্নটিকে নানাভাবে নেড়ে চেড়ে দেখেছেন। চরিত্রহীন, অমানুষ অকিঞ্চনের ব্যবহার ও বাক্যের অত্যাচারে বিধ্বস্ত কাত্যায়নী স্বামীর কাছে শেষপর্যন্ত কেঁদে বলেছিলেন, 'ছেলে আমাদের নাই, নাই নাই। ভগবানের দিব্যি করে বলছি আমাদের ছেলে নাই।' এই দম্পতিই বারো বৎসর পর সন্তানলাভের কৃতার্থ হয়েছিলেন। সেই স্বচ্ছ উজ্জ্বল অমৃতময় অনুভূতি কোথায় বিলীন হয়ে গেছে।

> "এ যেন নিঃশ্বাসে বিষ উদ্‌গীরণে দৃষ্টি অন্ধ আর অন্তরের সমস্ত মুখরতা তন্ময়তা নিরোধ করিয়া দিয়া অসাড় অচল একটা অস্বাভাবিক জড়বস্তুর মত চাপিয়া আছে, চাপে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকে।"

সন্তান যে কখনো কখনো বাবা মার কাছে প্রচণ্ড আতঙ্ক আর সুগভীর লজ্জার বিষয় হয়ে উঠতে পারে এই জাগতিক সত্য আমরা নানাবিধ আবরণে আচ্ছন্ন করার প্রয়াস নিই কিন্তু জগদীশ গুপ্ত কোনো আপোসরফার ধার ধারেন না। তিনি প্রকৃত 'ন্যাচারালিস্ট' কথা-সাহিত্যিক কিনা তা নিয়ে অনেক তাত্ত্বিক আলোচনা হয়েছে। আমরা শুধু এটুকু বলতে পারি মানবসমাজের বানিয়ে তোলা কৃত্রিম মূল্যবোধ, জগদ্দল প্রথা আর সংস্কার, নানা ধরনের বিচিত্র আধিপত্য— এইসব উপাদানে প্রস্তুত পর্বতপ্রমাণ সামাজিক শারীরিক, সর্বোপরি মানসিক চাপে গুঁড়িয়ে যাওয়া ব্যক্তিমানুষের জীবনের তিনি নির্মম, নিরপেক্ষ কথাকার।